উচ্চ ফলন ও আর্থিক মুনাফার লক্ষ্যে ফসল বৈচিত্র্য

রীতেশ সাহা, সিতাংশু সরকার, বিজন মজুমদার ও সোনালি ভট্টাচার্য্য

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সুসংহত পুষ্টিযুক্ত খাদ্যোপাদান ও সেচ ব্যবস্থা নির্ভর দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। ক্রমশ বেড়ে চলা জনসংখ্যায় প্রত্যেকের জন্য অন্নসংস্থানের উপায় ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অধিক মাত্রায় ফলনের মাধ্যমে হতে পারে। অর্থাৎ, প্রত্যেকের জন্য খাদ্যের জোগান দিতে প্রতি একক জমি থেকে আরও অনেক বেশি ফলন পেতে হবে। পরিমাপ করা গেছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির একই হার বজায় থাকলে, ২০২৫ সালে ৩০ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক বছর ৫০-৬০ লক্ষ টন করে খাদ্যশস্য বেশি উৎপাদন করে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ক্রমশ কমছে আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জনসংখ্যা। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্যের জোগান দেওয়াটাই বর্তমান সময়ে চিন্তার প্রধান কারণ। বিভিন্ন তথ্যসূত্র অনুযায়ী ধরে নেওয়া যায় যে আগামী ২০৫০ সালে ভারতের জনসংখ্যা ১৬৪ কোটিকে স্পর্শ করবে এবং সেই সঙ্গে মাথাপিছু জলের বাৎসরিক জোগান কমে দাঁড়াবে মাত্র ১১৪০ ঘনমিটার। একইভাবে এই বিপুল জনসংখ্যার জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ জমির পরিমাণ কমতে কমতে ১ বিঘার থেকেও কমে গিয়ে ঠেকবে (মাত্র ০.১০ হেক্টর)। ফলে খাদ্যের পর্যাপ্ত জোগানের জন্য এই সামান্য পরিমাণ জমি থেকেই অনেক বেশি উৎপাদনের উপায় বের করতে হবে বা কৃষির উল্লম্ব বিস্তারের প্রয়োজন দেখা দেবে।

ভূমির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে কৃষিতে নিবিড়তা বাড়ানোর পদ্ধতি গ্রহণের সূত্রেই অর্থনৈতিকভাবে টেকসই, বিবিধ ফসল বৈচিত্র্য সম্পন্ন কৃষিপ্রণালিই চাষিদের ঝুঁকি সামলানোর সুযোগ দেবে; ফলে জীবিকার নিশ্চয়তা বাড়বে। ফসলচক্রের নিবিড়তা ও বৈচিত্র্য মাটির ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈব বৈশিষ্ট্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে মাটির গুণগত মান বৃদ্ধি করে। পরীক্ষায় প্রমাণিত, শুধুমাত্র ভূমির উপরিতল সমান করেই ১০-২৫ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব হতে পারে, ৪০ শতাংশ জল সংরক্ষণ হয়, সারের ব্যবহারের কার্যকারিতা ১৫-২৫ শতাংশ বাড়ে এবং আল ও নালায় কম জমি লাগার দরুন, জমির পরিমাণ শতকরা ২-৬ শতাংশ বাড়ে।

দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়গুলি হল গাঙ্গেয় সমতলভূমি অঞ্চলের সেচনির্ভর গম চাষে উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা কমতে থাকা, প্রায় থমকে যাওয়া ফলনের মাত্রা এবং সাধারণভাবে কৃষিতে জলের অপ্রতুল জোগান। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সুসংহত পুষ্টিযুক্ত খাদ্যোপাদান ও সেচ ব্যবস্থা নির্ভর দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। ক্রমশ বেড়ে চলা জনসংখ্যায় প্রত্যেকের জন্য অন্নসংস্থানের উপায় ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অধিক মাত্রায় ফলনের মাধ্যমে করা যেতে পারে। ধরে নেওয়া যাক, ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা ১৬৪ কোটি হবে, তা হলে জনপ্রতি জলের জোগান কমে মাত্র ১১৪০ ঘনমিটার দাঁড়াবে, যা কিনা ২০০১ সালে ১৮২০ ঘনমিটারের কাছাকাছি ছিল। এভাবে চলতে থাকলে ২০২৫ সাল নাগাদ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ উন্নয়নশীল দেশে তীব্র জলসংকট দেখা দেবে। একইভাবে মাথাপিছু বরাদ্দ জমির পরিমাণ কমতে কমতে ২০২৫ সালে মাত্র ০.১ হেক্টর (বা ০.৭৫ বিঘা) হবে। তথ্য থেকে

[ড. সাহা ব্যারাকপুর-স্থিত কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী, মৃত্তিকা বিজ্ঞান। ই-মেল : saharitesh74@rediffmail.com। ড. সরকার সেই সংস্থায় শস্য বিজ্ঞান বিষয়ক প্রধান বিজ্ঞানী। ই-মেল : sarkaragro@gmail.com। ড. মজুমদার ওই একই সংস্থায় মৃত্তিকা রসায়ন বিষয়ক প্রধান বিজ্ঞানী। ই-মেল : bmajumder65@gmail.com। ড. ভট্টাচার্য্য পশ্চিমবঙ্গ উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত।]

এটা স্পষ্ট যে প্রত্যেকের জন্য খাদ্যের জোগান দিতে প্রতি একক জমি থেকে আরও অনেক বেশি ফলন পেতে হবে। পরিমাপ করা গেছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির একই হার বজায় থাকলে, ২০২৫ সালে ৩০ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক বছর ৫০-৬০ লক্ষ টন হারে খাদ্যশস্য বেশি উৎপাদন করে খাদ্য উৎপাদনের এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হবে।

যেকোনও ফসলচক্রের দীর্ঘদিন উচ্চ ফলনের স্থায়িত্ব জমির মাটির সঠিক এবং যথাযথ উর্বরতা ব্যবস্থাপনা, অর্থাৎ, পর্যাপ্ত ও সুষম পুষ্টিযুক্ত খাদ্যোপাদান জোগান ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। মাটির উচ্চ ফলন দেবার ক্ষমতা সুষম, সুসংহত বিচক্ষণ উদ্ভিদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, যেখানে জৈব উর্বরক উৎসের পূর্ণ ব্যবহার ও কেবলমাত্র প্রয়োজন ভিত্তিক ও আবশ্যিক রাসায়নিক সারের ব্যবহারকে মান্য করা হবে, তার উপর নির্ভর করে। ১৯৫০-৫১ সালে, এদেশে সারের ব্যবহার ছিল মাত্র ০.৫ কেজি প্রতি হেক্টরে/ প্রতি বছরে। ফলে উৎপাদন ছিল মাত্র ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন। ২০০৮-০৯ সালে সারের ব্যবহার বেড়ে হয়েছে ১১৭ কেজি/ প্রতি হেক্টরে/প্রতি বছরে, ফলে মোট ফলনও বেড়ে ২৩ কোটি টনে পৌঁছে গেছে। আর কেবলমাত্র প্রধান প্রধান উদ্ভিদ খাদ্যোপাদানের জোগানের ফলে ও অধিক ফলনের জন্য অন্যান্য খাদ্য উপাদান (যেমন—সালফার বা গন্ধক) এবং অনুখাদ্যের (জিঙ্ক, বোরন, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম) ঘাটতি দেখা গেছে। দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ ফলনলাভের পূর্বশর্ত হল, অঞ্চল ভিত্তিক ও শস্য পদ্ধতির রীতি অনুযায়ী সুষম ও পর্যাপ্ত উদ্ভিদ খাদ্যোপাদানের ব্যবস্থাপনা। ফসল উৎপাদনের অনুকূল পরিস্থিতি পেতে মাটির নিম্নমানের ভৌত অবস্থার পরিমার্জনা প্রয়োজন। মাটির ভৌত অবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন—মাটির কণার বিন্যাস (texture), গঠন (structure), আপাত ঘনত্ব (bulk density) ইত্যাদির উপর মাটির জলধারণ ও জোগান ক্ষমতা, অক্সিজেন পরিবহন ও পরিব্যাপ্তির মাত্রা (oxygen diffusion), মাটির তাপমাত্রা এবং ফসলের শিকড়ের জন্য ভৌত রোধ কী পরিমাণ হবে, তা নির্ভরশীল। তাই উচ্চ ফলনের জন্য মাটির যথাযথ কর্ষণ, ফসলের অবশিষ্টাংশের পুনর্ব্যবহার, মাটির শোধন, জলসেচ ও সময়মতো জলনিকাশি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অপরিহার্য। স্বাভাবিক জমিতে বারবার বেশিমাত্রায় কর্ষণ করার ফলে মাটির জৈব পদার্থ দ্রুত জারণ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষয় হয়, ফলে ফসলকে প্রয়োজনীয় জল ও পরিপোষক জোগান দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে মাটি। একথা অনস্বীকার্য যে প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত কমে আসা, সেই সঙ্গে দিন দিন জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা বহুগুণ বেড়েছে বলে তা পূরণের জন্য কৃষি পদ্ধতির আরও প্রগাঢ় বৃদ্ধি প্রয়োজনে হয়েছে। বহু বছর ধরে চলে আসা ঋতু পরিবর্তনের মাত্রা এখন আরও বেশি প্রকট—বৃষ্টির মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত, ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্কট, ক্রমবর্ধিত মজুরি—ইত্যাদি কারণে প্রথাগত ফসল বৈচিত্র্য ও চাষ পদ্ধতি আর অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বা কার্যকরী থাকছে না। সেজন্য বিশেষ যত্নের সঙ্গে সময়োপযোগী এবং পৃথক পৃথক জলবায়ু ভিত্তিক কৃষি অঞ্চলের জন্য নতুন ধরনের ফসল বৈচিত্র্য আনতে হবে এবং তা চাষিদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে হাতে-কলমে প্রদর্শন ক্ষেত্রের মাধ্যমে চাক্ষুষ দেখাতে হবে, যাতে সব অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার হয় এবং উৎপাদন ও লাভ বাড়ে। নতুন ফসল বৈচিত্র্যের বৈশিষ্টগুলি হবে : (১) নিম্ন মূল্যের শস্যের পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে উচ্চ মূল্যের শস্য উৎপাদন, (২) বেশি জল প্রয়োজন এমন ফসলের পরিবর্তে, কম জলে উৎপন্ন হয় এমন ফসলের চাষ বাড়ানো, (৩) এক ফসলি প্রথা থেকে বহুফসলি/বা যৌথ ফসলের ধারণা, (৪) কেবলমাত্র ফসল উৎপাদনের পরিবর্তে, ফসল-গবাদি পশু-মৎস্যচাষ-মৌমাছি পালন একত্রে করার বন্দোবস্ত, (৫) শুধুমাত্র কৃষিভিত্তিক কাঁচামালের উৎপাদন না করে—উৎপাদিত শস্যের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজন ইত্যাদি।

"মাটির উচ্চ ফলন দেবার ক্ষমতা-সুষম, সুসংহত বিচক্ষণ উদ্ভিদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, যেখানে জৈব উর্বরক উৎসের পূর্ণ ব্যবহার ও কেবলমাত্র প্রয়োজন ভিত্তিক ও আবশ্যিক রাসায়নিক সারের ব্যবহারকে মান্য করা হবে, তার উপর নির্ভর করে। ১৯৫০-৫১ সালে, এদেশে সারের ব্যবহার ছিল মাত্র ০.৫ কেজি প্রতি হেক্টরে/ প্রতি বছরে। ফলে উৎপাদন ছিল মাত্র ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন। ২০০৮-০৯ সালে সারের ব্যবহার বেড়ে হয়েছে ১১৭ কেজি/ প্রতি হেক্টরে/প্রতি বছরে, ফলে মোট ফলনও বেড়ে ২৩ কোটি টনে পৌঁছে গেছে।"

ফসল বৈচিত্র্য ও ভূমির পুনর্বিন্যাস : ভারতের পরিপ্রেক্ষিত

ভারতে মূলত ষাটের দশকের শেষ থেকে সত্তরের দশকের শুরুতে সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে কৃষি-প্রযুক্তির উন্নতির ফলে প্রধানত অর্থনৈতিকভাবে লাভদায়ক ফসল বৈচিত্র্য ব্যবহার করা শুরু হয়। ফসল বৈচিত্র্যের কারণ হিসাবে প্রধানত পাঁচ ধরনের নির্ণায়ক হেতু দায়ি। সেগুলি হল :

(ক) সেচ, বৃষ্টিপাত ও মাটির উর্বরতা বিষয়ক কারণ;

(খ) প্রযুক্তি বিষয়ক কারণ, যেমন উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, জলসেচ প্রযুক্তি; সেই সঙ্গে বাজার, গুদামজাত করার ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াকরণ;

(গ) মানুষের খাদ্যের ও গোখাদ্যের যথেষ্ট জোগান এবং চাষির কৃষিতে লগ্নি করার ক্ষমতা;

(ঘ) তা ছাড়া মূল্য বিষয়ক কারণগুলি হল—কাঁচামাল ও উৎপাদিত শস্যের দাম, বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক নিয়মকানুন, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বাজার মূল্যকে প্রভাবিত করে;

(ঙ) পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ও সমগোত্রীয় বিষয়ক কারণগুলির মধ্যে পড়ছে খামারের পরিমাপ ও স্বাধিকার, গবেষণা, সম্প্রসারণ, বাজার ব্যবস্থা এবং সরকারি বিধিনিষেধ ও এই সম্পর্কিত আইনকানুন।

কারণগুলির প্রত্যেকটি একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এগুলিই চাষিকে ফসল বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার নির্ণায়ক কারণ হিসাবে আলাদা আলাদা এবং একত্রিত ভাবে প্রভাবিত করে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কারণগুলির প্রভাব তুলনামুলক ভাবে পরিবর্তিত হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, ভারতীয় কৃষিতে এই ফসল বৈচিত্র্যের কারণগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক কারণটিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক, উভয় ক্ষেত্রেই অন্যান্য উৎপাদন কর্মকাণ্ডের মতোই কৃষিক্ষেত্রও বাণিজ্যকীকরণ ও বিশ্ব উদারীকরণ নীতি মেনে এগোনোর ফলে চাষিদের সিদ্ধান্তে—অর্থনৈতিক কারণগুলি বেশি করে প্রভাবিত করবে এটাই স্বাভাবিক। এই পথে কৃষির অগ্রগতির ফলে কৃষি পণ্যের বেশি উৎপাদন—জমির পরিমাণ বাড়ার ফলে নয় বরং চাষে ফসল বৈচিত্র্য গ্রহণ ও নিবিড় কৃষি ব্যবস্থার ফলে সম্ভব হচ্ছে। তবে পরবর্তী ধাপে কৃষিক্ষেত্রের অর্থনৈতিক উৎপাদনের হারের বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির থেকেও উৎপাদিত শস্যের মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে বেশি করে হবে। তাই বিচক্ষণ ফসল বৈচিত্র্যের উদ্দেশ্য হতে হবে—অর্থনৈতিকভাবে ফলপ্রসু এবং এমন সব শস্যের চাষ, যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই রোগ, পোকা এবং আগাছার প্রকোপ কম হবে, মাটির জীবাণুর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে, জনমজুরের উপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং চাষিদের কৃষি বিষয়ক ঝুঁকি সামলানোর ক্ষমতা বাড়বে।

রবি ফসলে মাটির অবশিষ্ট জলের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সঠিক পদ্ধতিতে ভূমির উপরিতলের পুনর্বিন্যাস জরুরি। উদাহরণ স্বরূপ—জাভা এবং ইন্দোনেশিয়ায় উত্থাপিত ও নিমজ্জিত জমি (যাকে স্থানীয় ভাষায় সোরজান বলা হয়) খুবই জনপ্রিয়। এই পুনর্বিন্যস্ত জমির উঁচু অঞ্চলে উচ্চমূল্যের ফসল ও নিচু অঞ্চলে ধান চাষ করা হয়। এই ধরনের ভূমির পুনর্বিন্যাস স্থায়ী অথবা সাময়িক হতে পারে। সাময়িকভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয় ধান কাটার পরে এবং প্রধানত সবজি চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এক্ষেত্রে জমির নিচু ভাগ ব্যবহৃত হয় না, ফলে মোট জমির প্রায় শতকরা ২০-৪০ ভাগ অব্যবহৃত থাকে। আর স্থায়ীভাবে পুনর্বিন্যস্ত জমির পুরোটাই সারা বছর বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের কাজে লাগে। উঁচু ভাগে সবজি বা সমগোত্রীয় ফসল ও নিচু ভাগে প্রায়শই ধান/মাছ চাষ করা হয়। এর ফলে ওই জমির শস্য নিবিড়তা যেমন বাড়ে, সেই সঙ্গে চাষির আয়ও বৃদ্ধি পায়। কৃষিতে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানের সঠিক ও সংহত প্রয়োগের জন্য জমির উপরিতলের সমতা আবশ্যিক। এটা প্রমাণিত যে সমতল জমিতে সেচের জল এবং সারের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার হয় এবং অপচয় হয় ন্যূনতম। উত্তর ভারতীয় সমতল ভূমি অঞ্চলে জমি তৈরির সময় লেজার-নিয়ন্ত্রিত ভূমি পুনর্বিন্যাস যন্ত্রের ব্যবহারে জমির গড় উচ্চতার ফারাক মাত্র ±২ সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকে। কেবলমাত্র জমির উপরিভাগ সমতল করে ফসলের উৎপাদন ১০-২৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো যায়, সেচের জলের প্রয়োজন ৪০ শতাংশ কম হয়, উদ্ভিদ খাদ্যের ব্যবহারের দক্ষতা ১৫-২৫ শতাংশ বাড়ে এবং আল ও নালার পরিমাণ কমায় মোট জমির পরিমাণ ২-৬ শতাংশ বাড়ে।

বৃষ্টিনির্ভর চাষ অঞ্চলে ফসল বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ওই অঞ্চলের পুষ্টির নিরাপত্তা বাড়ানো, আরও কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং পরিবেশ সহায়ক কৃষি সম্ভব। এরকমের কিছু বিচার্য বিষয় এবং ফসল বৈচিত্র্যের ফলে কী ধরনের লাভ এই অঞ্চলে পাওয়া যেতে পারে তা ১নং সারণিতে লিপিবদ্ধ করা হল। এই অঞ্চলে ফসল বৈচিত্র্যের ফলে যা যা লাভ হতে পারে তা হল : (ক) বিকল্প ফসল থেকে বেশি লাভ, (খ) রোগ-পোকার প্রকোপ কম, (গ) জনমজুরের সুবিন্যস্ত ব্যবহার, (ঘ) বিকল্প ফসলগুলির লাগানোর ও কাটার সময় আলাদা আলাদা হবার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কম ঝুঁকি, (ঙ) নতুন বিকল্প শস্য উচ্চ মূল্যের পণ্যের নবীকরণযোগ্য উৎস হতে পারে।

সারণি-১
ফসল বৈচিত্র্যের ফলে বিচার্য বিষয়গুলি এবং সেই সম্পর্কিত লাভ

বিচার্য বিষয়	ফসল বৈচিত্র্যের ফলে লাভ
উৎপাদন ও স্থায়িত্ব/ উচ্চ ঝুঁকি ও ব্যয়বহুলতা	বর্ষজীবি ও বহুবর্ষীয় মিশ্রিত ফসলের উৎপাদনের মাধ্যমে ফলন ও আয় বৃদ্ধি, ফলে ঝুঁকি ও খরচ কমবে
জমির অবনয়ন/অবক্ষয়	ভূমির সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে জমির অবক্ষয় বা অবনতি কম হবে
অপ্রতুল কর্মসংস্থান	সারা বছর ধরে ধাপে ধাপে কর্মসংস্থান
লভ্যাংশের নিম্নগামিতা	বিভিন্ন উপাদান থেকে বেশি আয়
শক্তির ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা	শক্তির উচ্চ ব্যবহার সক্ষমতা সম্পন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার

"বৈচিত্র্যময় ফসলচক্র রোগের ও আগাছার প্রকোপ কমিয়ে, শিকড়ের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে, মাটির জলের সদ্ব্যবহার এবং খাদ্যোপাদানের জোগান সুনিশ্চিত করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। আদর্শ ফসল বৈচিত্র্যে এমন ফসল বাছাই করা হয় যাদের বেড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় উপকরণ ভিন্ন ধরনের।"

ফসল বৈচিত্র্যের প্রভাব

বৈচিত্র্যময় ফসলচক্র রোগের ও আগাছার প্রকোপ কমিয়ে, শিকড়ের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে, মাটির জলের সদ্ব্যবহার এবং খাদ্যোপাদানের জোগান সুনিশ্চিত করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। আদর্শ ফসল বৈচিত্র্যে এমন ফসল বাছাই করা হয় যাদের বেড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় উপকরণ ভিন্ন

সারণি-২
ভার্টিসল মাটিতে সোয়াবীনের তুল্য ফলনের হিসাবে সর্বমোট ফলনে ভূমির বিন্যাস ও ফসল বৈচিত্র্যের প্রভাব

	সোয়াবীনের তুল্য ফলনের হিসাবে সর্বমোট ফলন (কিলোগ্রাম প্রতি হেক্টরে)							
	জমি প্রশস্ত-মাদা এবং নালি যুক্ত				জমির উপরিতল সমতল/চ্যাপ্টা			
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭
ছোলা ফসলে সেচ								
সেচ-১	২৮১৮	২৭৪৭	৩৮৫৭	৩৫৫১	২২৫৭	২৪২৫	৩৩৭০	৩১৬৫
সেচ-২	২৯২৯	২৯০৩	৪১৯৬	৩৯০০	২৪২২	২৫৪২	৩৫৯১	৩৫৭৬
শস্য পদ্ধতির রীতি								
সোয়াবীন-ছোলা	৩৫৩০	২১০৯	৩০১৯	৩০৪৪	২৬৯৮	১৮৯৪	২৬১৩	২৬৯১
ভুট্টা-ছোলা	২৯৩১	৩৪৫৭	৪৫০৭	৪৩৫৪	২২৯৫	৩০৩৬	৩৮৩২	৩৯৫৯
সোয়াবীন/ভুট্টা-ছোলা	৩৩৮৫	২৮০৭	৪৫৬৪	৪১৪৫	২৭৯৮	২৪৮৫	৩৯৩৩	৩৭৬৫
সোয়াবীন/অড়হর	২৬১৫	২৩৬৯	৩৫৩২	৩১৩৪	২২৬২	২০২৭	২৯১২	২৭৭৮
ভুট্টা/অড়হর	১৯০৭[ক]	৩৩৮৫	৪৫১৩	৩৯৫১	১৬৪৬	২৯৭৫	৪১১২	৩৬৫৯

[ক]২০০৩-০৪ সালে অড়হরের একক ফসল লাগানো হয়েছিল।

ধরনের। যেমন, বেশি নাইট্রোজেন ব্যবহারকারী ভুট্টার সঙ্গে সোয়াবীন বা মুসুর ডাল জাতীয় কম নাইট্রোজেন চাহিদাসম্পন্ন শস্য ফসল বৈচিত্র্যে স্থান করে নিতে পারে। পরীক্ষায় প্রমাণিত যে ডালজাতীয় শস্য চাষের পরে সেই জমিতে গম লাগালে ফলন বেশি হয় এবং এই ফলন বৃদ্ধি নাইট্রোজেন ও অন্যান্য লাভের দৌলতে হয়ে থাকে।

যেখানে জমিতে জলের অভাব, এমন অঞ্চলের ফসল বৈচিত্র্যে বিভিন্ন মাত্রার জলের প্রয়োজন এমন সব ফসল যোগ করতে পারলে মোট উৎপাদন বাড়ে এবং সারের যথাযথ ব্যবহার সম্ভবপর হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে মুসুর (lentil)-মসিনা (flax) ফসল ওঠার পরে জমিতে গম লাগালে, সেই গম বেড়ে ওঠার জন্য ৭৪ মিলিলিটার জল পায়, কিন্তু সর্ষের পরে লাগালে মাত্র ৪৫ মিলিলিটার ও গমের পরে লাগালে ৫৯ মিলিলিটার জল পাবে। তাই যেখানে জলের অভাব আছে, সেখানে গমের আগে মুসুর-মসিনাকে ফসলচক্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ফসল বৈচিত্র্য শস্যের খাদ্যোপাদানের চাহিদা ও জোগানকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। যেমন, কোনও ফসলের অবশেষে যদি নাইট্রোজেনের মাত্রা কম থাকে তা পরবর্তী ফসলের নাইট্রোজেন গ্রহণ পদ্ধতির উপর প্রভাব ফেলবে। ফসলের অবশেষে কী মাত্রার নাইট্রোজেন আছে তার উপর নির্ভর করে এই নাইট্রোজেনের নিশ্চলীকরণ (immobilozation) ও সহজলভ্যতার (mineralization) ভারসাম্য কোন দিকে যাবে। সব ফসলের অবশেষ অবশ্যই ধীরে ধীরে পচন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাবে এবং তার অভ্যন্তরের সব খনিজ পদার্থ (খাদ্যোপাদান) মুক্ত করবে। এই অবশিষ্টাংশে যদি কার্বন/নাইট্রোজেনের অনুপাতে খুব বেশি ফারাক থাকে তবে অবশেষের পচনকাল দীর্ঘ হবে। দেখা গেছে যদি ফসলে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন ঘটিত সার দেওয়া হয়, তবে সেই ফসলের অবশেষ তাড়াতাড়ি পচে। এমনকি এও দেখা গেছে, যথেষ্ট নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ দ্বারা উৎপাদিত গমের অবশেষ, ডাল জাতীয় শস্যের অবশেষের মতো একই দ্রুততায় পচছে। তাই বলা যায় যে, কী জাতীয় ফসল এবং কতটা সার প্রয়োগে উৎপাদন করা হয়েছে, তার উপর নির্ভর করবে এই সব ফসলের অবশেষে কতটা পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকবে এবং কী পরিমাণে পরবর্তী ফসলকে তা দিতে পারবে। ফসলের অবশেষ কীভাবে জমিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তার উপরও নির্ভর করে—অবশেষের পচনের পরে কতটা নাইট্রোজেন পরবর্তী ফসলকে দিতে পারবে। যদি বেশি ফারাকের কার্বন/নাইট্রোজেন অনুপাতের ফসল অবশেষ নাইট্রোজেন ঘটিত সারের সঙ্গে জমিতে প্রয়োগ করা হয়, তবে দেখা গেছে ফসলের অবশেষের নাইট্রোজেন পরবর্তী ফসল পাবে না, বরং সারের মাধ্যমে প্রযুক্ত নাইট্রোজেনও ওই পচন প্রক্রিয়ার জীবাণুরা ব্যবহার করবে এবং ফসল নাইট্রোজেন থেকে বঞ্চিত হবে। এছাড়াও ফসলের অবশেষের প্রয়োগের পরে যদি জমিতে ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেই সার থেকে নাইট্রোজেন বাষ্পীভবন বা সমগোত্রীয় পদ্ধতিতে নষ্ট হবে। তাই এই অবস্থায় নাইট্রোজেন ঘটিত সার মাটির উপরে না দিয়ে কিছুটা নিচের স্তরে প্রয়োগ করতে হবে এবং মাটির উপরিভাগে বেশি ফারাক অনুপাতের কার্বন/নাইট্রোজেন যুক্ত শস্যের অবশেষ প্রয়োগ করা দরকার।

ফসলের নিবিড়তা ও বৈচিত্র্য মাটিতে ফসফরাসের সক্রিয়তা প্রভাবিত করে। একই জমিতে পর পর ফসল উৎপাদিত হতে থাকলে এবং জৈব বা অজৈব কোনও প্রকারেরই ফসফরাস জমিতে না দেওয়া হয়, তাহলে দ্রুত ফসফরাসের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় এবং এই ঘাটতি জৈব ও অজৈব দুই প্রধানের ফসফরাসের ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। জমিকে পতিত রাখার বারের সংখ্যা বাড়াতে থাকলে জমি থেকে ফসফরাসের দ্রুত ঘাটতি হয় না। গত ২৪ বছর ধরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বার বার জমি পতিত রাখলে মাটিতে ফসফরাসের মাত্রা বাড়ে। তাছাড়া

সারণি-৩
ভূমির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে তৈরি প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত এবং উপরিতল সমতল/চ্যাপ্টা জমির থেকে বর্ষার জল নির্গমন ও মাটি ক্ষয়ের খতিয়ান

সাল	বৃষ্টিপাত	বর্ষার অতিরিক্ত জল নির্গমন (মিলিমিটার)		মাটি ক্ষয়ের পরিমাপ (কিলোগ্রাম/হেক্টরে)	
	(মিমি)	প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত	উপরিতল সমতল/ চ্যাপ্টা	প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত	উপরিতল সমতল/চ্যাপ্টা
২০০৩	১০৫৮	১৬৩.০ (১৫.৪ শতাংশে)	২১৪.৯ (২০.৩ শতাংশে)	১৯৫৬	২৮৩৭
২০০৪	৭৯৮	১২৪.০ (১৫.৫৪ শতাংশে)	১৮৩.৩ (২৩.০ শতাংশে)	৬৫৭	১৪৬৬
২০০৫	৯৪৬	১৭৭.০ (১৮.৭ শতাংশে)	২৪৬.০ (২৬.১ শতাংশে)	১৪০২	৩১২৩
২০০৬	১৫১৩	৫০২.০ (৩৩.২ শতাংশে)	৮৭৩.০ (৫৭.৭ শতাংশে)	৩৫০৩	৬৩৬৫
(বন্ধনীর মধ্যে ঋতু হিসাবে বৃষ্টির শতকরা ভাগ দেখানো হয়েছে)					

জমিতে ফসফরাস ও নাইট্রোজেন উভয়ই প্রয়োগ করা হলে এবং পর পর ফসল লাগালেও ফসফরাসের জোগান বাড়ে এবং এই বৃদ্ধি ফসল দ্বারা ফসফরাসের অপসারণ থেকে বেশি। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, ফসফরাসের এই বৃদ্ধি হয় প্রকৃতপক্ষে মাটির নিচের স্তর থেকে ফসফরাস উপরের দিকে জৈব প্রক্রিয়ায় উঠে আসে বলে।

বিভিন্ন ধরনের ভূমির পুনর্বিন্যাস, যেমন—উঁচুমাদা-নিচু জমি, আল-নালি ইত্যাদির ফলে জমি থেকে বৃষ্টির জলের দূরীকরণ ও মাটির ক্ষয় কমে এবং মাটির নিচের স্তরে জলের প্রবেশের পরিমাণ বাড়ে। এই ধরনের ভূমির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে জল বয়ে যাবার গতিবেগ কমে, ফলে মাটির গভীরে জল প্রবেশ করার সময় পায়। তাছাড়াও হঠাৎ বেশি বৃষ্টিপাত হলে জমিতে তৈরি করা নালি অঞ্চল দিয়ে অতিরিক্ত জল সহজেই জমি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এবং জল জমে ফসলের ক্ষতি করতে পারে না।

ভোপালে পরীক্ষার মাধ্যমে এই ধরনের পুনর্বিন্যাস করা জমিতে পাঁচ ধরনের ফসলচক্র ব্যবহার করে তাদের একের অপরের উপর প্রভাব দেখা হয়েছে। এই পাঁচ ধরনের ফসলচক্র ছিল—(১) সোয়াবীন-ছোলা, (২) ভুট্টা-ছোলা, (৩) সোয়াবীন/ভুট্টা অন্তর আবাদ-ছোলা, (৪) সোয়াবীন/অড়হর অন্তর আবাদ, (৫) ভুট্টা/অড়হর অন্তর আবাদ। বর্ষার ফসলগুলি বৃষ্টির জলে উৎপন্ন করা হয়েছে আর শীতের ফসলে (যেমন, ছোলা) দু'বার সেচ দেওয়া হয়েছিল। এই পরীক্ষার থেকে দেখা গেছে, ছোলাতে সেচ দেওয়া হোক বা না হোক, প্রশস্ত-মাদা ও নালি ব্যবস্থায় অন্য সমতল অবস্থার থেকে বেশি ফলন পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ধরনের ফসলচক্রের মধ্যেও মোট ফলনের মাত্রাভেদ আছে (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

"সাধারণভাবে বলতে গেলে, উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলের মাটিতে জৈব কার্বনের পরিমাণ ও অন্যান্য খাদ্যোপাদানের মাত্রা বেশি। এর একটা প্রধান কারণ হল জমির চারপাশের ছোটো ছোটো পাহাড় ও টিলা থেকে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটির খাদ্যোপাদান জমিতে বয়ে আসে। সাধারণ চাষিরা তাই কোনও রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করেই ধান চাষ করেন, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে চাষিরা প্রতি ৩-৪ বছর অন্তর অল্প মাত্রায় (৫ টন/প্রতি হেক্টরে) জৈব সার, যেমন খামার সার ব্যবহার করেন।"

এই ফসল-চক্রগুলির মধ্যে সোয়াবীন-ছোলা এই চক্র সব থেকে কম ফলন দিয়েছে। পরিলক্ষিত হয়েছে যে, যেসব ফসল-চক্রে ভুট্টাকে শামিল করা হয়েছে তার সব কয়টির ক্ষেত্রেই মোট ফলন বেশি। যদি ছোলায় জলসেচ না দেওয়া হয়, তবে ভুট্টা/অড়হর অন্তর আবাদ শুধুমাত্র সোয়াবীন ফসলের চাষ থেকে অনেক ভালো। তাই এই পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ভোপাল সংলগ্ন অঞ্চলের জন্য ভুট্টা-ছোলা, সোয়াবীন/ভুট্টার অন্তর আবাদ-ছোলা, ভুট্টা/অড়হর অন্তর আবাদ এই ধরনের ফসল বৈচিত্র্য কেবলমাত্র সোয়াবীন লাগানোর থেকে বেশি লাভজনক।

বর্ষা ঋতুতে প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত জমি ও উপরিতল সমতল বা চ্যাপ্টা এই দুই ধরনের পুনর্বিন্যাস করা জমিতে প্রবাহিত বর্ষার জল এবং মাটির ক্ষয়ের পরিমাপ করা হয়েছে। চার বছর ধরে (২০০৩-০৪ থেকে ২০০৬-০৭) চালানো পরীক্ষায় দেখা গেছে যে বয়ে যাওয়া বর্ষার জলের পরিমাণ প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত জমির ক্ষেত্রে উপরিতল সমতল বা চ্যাপ্টা জমির থেকে অনেক কম (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)। এর কারণ হিসাবে দেখা গেছে, এই ধরনের প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত জমির ঢাল সবজায়গায় সমান বা একই ধরনের হওয়ায় জল বয়ে যাওয়ার গতি তুলনামূলকভাবে কম, ফলে মাটির গভীরে জল প্রবেশ করার সময় পায়। এই ধরনের প্রশস্ত-মাদা ও নালি জমিতে ওই সময়কার মোট বৃষ্টিপাতের মাত্র ২৪.৩ শতাংশ জল প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু উপরিতল সমান বা চ্যাপ্টা জমির ক্ষেত্রে এই বয়ে যাওয়া জলের পরিমাণ ৩৯ শতাংশ। পরীক্ষার চার বছরের মধ্যে যে বছর বেশি বৃষ্টি হয়েছে, সেই বছরে মাটির ক্ষয়ের পরিমাণও বেশি (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)।

যেমন, ২০০৪ সালের বর্ষা ঋতুর বৃষ্টির পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৯৮.২ মিলিমিটার এবং প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত ক্ষেত্রে মাটির ক্ষয়ের পরিমাণ ছিল ৬৫৭ কেজি/হেক্টরে; কিন্তু ২০০৬ সালে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে হয় ১৫১৩ মিলিমিটার এবং মাটি ক্ষয়ের পরিমাণও বেড়ে হয় ৩৫০৩ কেজি/হেক্টরে। সেই সঙ্গে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে প্রতি বছরই প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত জমির মাটি ক্ষয়ের

সারণি-৪
বিভিন্ন ফসলচক্রে ফসলের অবশেষের পুনর্ব্যবহারে মাটির উদ্ভিদ খাদ্যোপাদানের উপর প্রভাব

ফসল-চক্র	সহজলভ্য নাইট্রোজেন (কেজি/হেক্টর)	সহজলভ্য ফসফরাস (কেজি/হেক্টর)	সহজলভ্য পটাশিয়াম (কেজি/হেক্টর)
ধান-আলু	২৬৩.৭	৭.৯৩	৩৪৯
ধান-টমেটো	২৫৯.৫	৭.৮৮	৩৪৬
ধান-বীন	২৭৭.০	৮.৭৬	৩৫৩
ধান-গাজর	২৬৬.৪	৭.৮৬	৩৩৭
ধান-বাঁধাকপি	২৫২.২	৭.৪৭	৩২৮
ধান-পতিত	২৬৮.০	৭.৬৭	৩৪৮
প্রাথমিক মান	২৬৪.০	৬.৯৭	৩২১

পরিমাণ শতকরা ৩১-৫৫ ভাগ কম। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই দুই ধরনের ভূমির পুনর্বিন্যাসের মধ্যে প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত জমির বৃষ্টির জল বয়ে যাওয়ার পরিমাণ এবং মাটির ক্ষয়ের পরিমাণ উপরিতল সমতল বা চ্যাপ্টা জমির থেকে অনেক কম। এছাড়াও এই প্রশস্ত-মাদা ও নালি জমি হঠাৎ করে বেশি বৃষ্টিপাতের দরুন জমা অতিরিক্ত জল বের করে দেয় এবং বর্ষার ঋতুতে জমিতে অপ্রয়োজনীয় জল দাঁড়াতে দেয় না। পরবর্তীকালে জলের অভাবের সময়ও এই ধরনের জমির মাটিতে জল বেশি দিন সঞ্চিত থাকে এবং ফলন বেশি দেয়। চাষিরা তাই বলদ-টানা লাঙ্গল দিয়ে এই ধরনের জমির পুনর্বিন্যাস করতে পারেন ও সেখানে সহজেই সোয়াবীন, ভুট্টা, অড়হর এবং ছোলা চাষ করতে পারেন। তাছাড়া এই অঞ্চলের চাষিরা প্রথাগতভাবে সোয়াবীনের পরিবর্তে নতুন ফসলচক্র যেমন—ভুট্টা-ছোলা, সোয়াবীন/ভুট্টা অন্তর আবাদ-ছোলা এবং ভুট্টা/অড়হর অন্তর আবাদ গ্রহণ করতে পারেন। বর্ষার যে অতিরিক্ত জল বয়ে যাবে, তা ওই অঞ্চলের পুকুরে ধরে রাখা যেতে পারে, যাতে প্রয়োজনের সময় ফসলে জীবনদায়ী সেচের বন্দোবস্ত করা যায়। এর ফলে ওই সব অঞ্চলে মোট উৎপাদন অনেক বাড়বে, উৎপাদন উপাদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং দীর্ঘস্থায়ী ফলন দেবার মতো স্বাস্থ্য বজায় থাকবে মাটির।

ফসল বৈচিত্র্য ও ভূমির পুনর্বিন্যাস : উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিপ্রেক্ষিত

সাধারণভাবে বলতে গেলে, উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলের মাটিতে জৈব কার্বনের পরিমাণ ও অন্যান্য খাদ্যোপাদানের মাত্রা বেশি। এর একটা প্রধান কারণ হল জমির চারপাশের ছোটো ছোটো পাহাড় ও টিলা থেকে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটির খাদ্যোপাদান জমিতে বয়ে আসে। সাধারণ চাষিরা তাই কোনও রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করেই ধান চাষ করেন, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে চাষিরা প্রতি ৩-৪ বছর অন্তর অল্প মাত্রায় (৫ টন/প্রতি হেক্টরে) জৈব সার, যেমন খামার সার ব্যবহার করেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও, বর্ষার পরে ও রবি মরশুমে জলের অভাব প্রকট হয়। সেজন্য রবি মরশুমে চাষিরা বিশেষ কোনও ফসল ফলাতে পারেন না। চাষিদের এই সঙ্কটের অবসানের জন্য বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, এই অঞ্চলের জমিকে উত্থাপিত মাদা (raised and sunken bed)-এইভাবে জমির পুনর্বিন্যাস করেই রবি মরশুমে ফসলে জলের জোগান বাড়ানো যায় এবং ফলনও বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে এই পদ্ধতিতে জমির নিচু অংশে জল প্রায় ৯০-১০০ দিন ধরে থাকতে পারে।

খামারে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় ফসলচক্রের মধ্যে ধান-টমেটো, এই চক্র সবচেয়ে বেশি ধানের তুল্য ফলন দিয়েছে (২১৪ কুইন্ট্যাল/হেক্টরে), তার পরে ধান-গাজর (২০৬ কুইন্ট্যাল/হেক্টরে) এই চক্রের স্থান। তবে গাজরের দাম বেশি হওয়ার জন্য ধান-গাজর এই ফসলচক্রে মোট আয়ের পরিমাণ সব থেকে বেশি (৬৬,৬৩৫ টাকা প্রতি হেক্টরে)। মাটির খাদ্যোপাদানের পরিমাণ বাড়াতে সব থেকে ভালো ফল দিয়েছে ধান-বীন এই চক্র; এক্ষেত্রে মাটিতে প্রতি হেক্টরে ২৭৭ কেজি সহজলভ্য নাইট্রোজেন, ৯ কেজি ফসফরাস এবং ৩৫৩ কেজি পটাশিয়ামের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে (সারণি-৪ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া মাটিতে রাইজোবিয়াম, অন্যান্য ব্যাক্টিরিয়া, ফসফরাস দ্রবণক্ষম জীবাণু এবং কেঁচোর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই অঞ্চলের পুনর্বিন্যাস করা উঁচু-নিচু মাদা জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসলচক্র লাগিয়ে দেখা গেছে যে ধান-টমেটো/মটর, এই ফসলচক্রে মাটির স্তরে জলের পরিমাণ সব থেকে বেশি ছিল (২৯.৩), কিন্তু ধান-পতিত এই ফসলচক্রে মাটির স্তরে জলের পরিমাণ অনেকটাই কম (২২.৫) ছিল। তাই ধান-টমেটো/মটর, এই ফসলচক্র সবথেকে বেশি ধানের তুল্য উৎপাদন দিয়েছে (১৮,১৩৪ কেজি/প্রতি হেক্টরে)। প্রতিদিন হিসাবে এই উৎপাদন যথেষ্ট বেশি (৭৭ কেজি/প্রতি হেক্টর/প্রতি দিন)।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে শস্য পর্যায়ের বৈচিত্র্য এবং ফসলের নিবিড়তা বাড়ালে তা মাটির খাদ্যোপাদানকে প্রভাবিত করবে। এর ফলে যেমন ফলন বাড়বে, সেই সঙ্গে মাটি থেকে খাদ্যোপাদান বেশি করে অপসারিত হবে। তাই এই ধরনের কৃষি ব্যবস্থায় অপসারিত খাদ্যোপাদান অবশ্যই বাইরে থেকে সঠিক হারে ও সুষম ভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদিত শস্যের গুণমান উন্নত থাকে এবং মাটির ক্ষয় না হয়। ফসলের অবশেষ অংশ আবার জমিতে যতটা সম্ভব ফিরিয়ে দিতে হবে, যাতে ফসলের খাদ্যোপাদান সঠিকভাবে পুনরায় ব্যবহৃত হতে পারে। ফসলচক্রে শিম্বজাতীয় শস্যকে শামিল করাকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে, এতে মাটিতে নাইট্রোজেন চক্র স্বাভাবিক ভাবে কার্যকরী থাকবে। ফসফেট ও পটাশ খাদ্যোপাদানকেও বিশেষ যত্নের সঙ্গে ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিতে হবে। ফসলের চাহিদা অনুযায়ী মাটিতে উদ্ভিদ খাদ্যোপাদানের জোগানে সমতা বজায় রাখতে হবে, যাতে তা দীর্ঘদিন ধরে যথেষ্ট ফলন দেয় এবং সেই সঙ্গে পরিবেশের উপর কোনও দীর্ঘমেয়াদি বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি না করে। ❑